মায়াসড়ক

বুকের ভিতর জমে থাকা নিশ্বাসটুকু ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল পাঁচু মান্না। তারপর রিকশাটা ঠেলে তুলল সাঁকোর ওপর। সাঁকোর নীচে খালের কালে জলে এখন চাঁদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে। নড়বড়ে সাঁকোয় সাবধানে রিকশাটাকে ঠেলে এনে বড়ো রাস্তায় উঠল। উঠে বসল রিকশায়। নিশ্বাস মেশানো স্বরে বলল, চল মেরা সফর। প্যাডেল মারতেই এগিয়ে চলল পাঁচুগোপালের ঝরঝরে তিন চাকার যানটি।

রাস্তায় এই মুহূর্তে একমাত্র মানুষ পাঁচু;আর কেউ কোথাও নেই। রাস্তার উঁচু পোস্টের আলোগুলোও আজ যেকোনো কারণে জ্বলছে না; তাই চারপাশে দৃষ্টির ভিতর আর কোনো আলোর অস্তিত্ব চোখে পড়ছে না। চাপ-চাপ অন্ধকার বুকে নিয়ে বাড়ি, গাছ, ঝাঁপ বন্ধ দোকানগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে। নীল অন্ধকারে ওগুলোকে এক একটা পাহাড় বলে মনে হচ্ছে।

মধ্যরাতের গাঢ় নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলল পাঁচু। প্যাসেঞ্জার নিয়ে এতটা আসার সময় ফেরার ব্যাপারটা ভাবনায় আসেনি। ভাড়ার অঙ্কটাই তখন মাথায় ছিল।

—সফর, ক-টা বাজে বল তো? সময়ের চিন্তাটা মাথায় আসে হঠাৎ পর মুহূর্তে তা মিলিয়েও যায় মাথা থেকে।

ফিনফিনে বাতাস বইছে। নীল আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে রাশি রাশি নক্ষত্র। পূর্ণিমার প্রাক্কালে খণ্ডিত চাঁদ থেকে গড়িয়ে আসা রঙে চারপাশটা মায়াবী উপত্যকার রূপ নিয়েছে।

ধীর গতিতে পাঁচু প্যাডেল মারতে থাকে। মধ্যরাতের এই যাত্রা ওকে এক ভালো লাগার জগতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একটা গান ধরে পাঁচু—

গোরাচাঁদ একদিন রহিল অনেক দূর,
গোরা গেল বালান্ডায় একদিন আনারপুর।
হেতে গড়ে যেতে গোরার মা দিয়েছে বাধা,
হেতে ঘরে যায় না গোরা আছে হারামজাদা...

পাঁচুর ফ্যাসফেসে গলায় গাওয়া গানের শুর আর ভাষায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে জমে থাকা নৈঃশব্দ্য। গাইতে গাইতে একসময় থামল পাঁচু। মনে পড়ল সেই বুড়ো ফকিরের কথা; যে সুর করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে শুনিয়ে বেড়াত এই গান। সাদা লম্বা দাড়ি, আর রংচঙে জোব্বায় পাঁচু একটা আবছা মুখ দেখতে পেল। অস্পষ্ট মুখটাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেও সফল হল না পাঁচু। সে জায়গায় ভেসে এলো কালো ভাঙাচোরা এক বৃদ্ধার মুখ। বেশ স্পষ্ট।

পাঁচুর ঠাকুমা। ঠাকুমার মুখের কথাগুলো বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল পাঁচু। মনের মধ্যে ফিরে এলো শৈশব। ঠাকুমা বলত, ওরে পেঁচো রে, তুই যে আমাদের পেঁচো ঠাকুরের দোর ধরা। জন্মের পর তোকে পেঁচোয় ধরেছিল রে; পেঁচো ঠাকুরই তোকে আবার আমাদের কাছে ফেরাল রে। ঠাকুমার সুর করে বলা কথাগুলোই লিকলিকে পায়ের পাঁচুগোপালকে ফিরিয়ে আনত ঠাকুমার কোলের কাছে।

পেঁচো ঠাকুরের রক্ষাকবচ লোহার বালা পাঁচুর সরু পায়ে এগারো বছর অবধি ছিল।

রিকশায় প্যাডেল মারতে কোনো বাড়তি শক্তি প্রয়োগ করে না পাঁচু। বাড়ি ফেরার আজ আর নেই কোনো তাগিদ। মালতি চলে যাবার পর এই রিকশাটাই ওর সবচাইতে কাছের জন। মালতিরও খুব প্রিয় ছিল তিন চাকার এই বাহনটি। মালতিই নাম রেখেছিল 'সফর'। পাঁচু লোক ডেকে রিকশার পেছনে লাল রং দিয়ে বাহার করে লিখিয়ে নিয়েছিল নামটা।

মালতিকে ধরে রাখতে পাঁচু অনেক চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার বলল, রে দেব, ভালো থাকবে। প্রথম প্রথম পাঁচু বুঝত না 'রে' কী! পরে জেনেছিল। তখন থেকেই হু হু করত মনটা। একসময় ছেলে বুল্টুকে ওর কাছে রেখে চলে গেল মালতি।

মালতির কথা মনে পড়তে মন কেমন করে উঠল ওর। আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর আবার সুর করে গান ধরল—

মায়ের বাধা গোরাচাঁদ না শুনিল কানে,

আকনের সঙ্গে যুদ্ধ হইল হেন কালে।

আকানন্দ বাকানন্দ রাবণের শালা...

তারপরের লাইনটা আর মনে পড়ল না পাঁচুর; চেষ্টা করেও না। সেই লাইনটা ছেড়ে দিয়ে আবার শুরু করল—

কী জানি আল্লার মর্জি— নসিবের ফের,

চোকো বানে গোরাচাঁদের কাটা গেল ছের।

শেষ লাইন দুটো দু-বার গাইল ও। গান থামতে হাসতে লাগল আপন মনে। হাসতে হাসতেই বলল, গান শুনলি সফর, অনেক দিন পর গাইলাম, সবটা মনে নেই রে!

...আজ অনেক কথা মনে পড়ছে বুঝলি। আজ তোকে আমার গল্প বলব। তুই তো আমার অনেক কথাই জানিস, যা জানিস না তা-ও বলব আজ...কিন্তু কী গল্পই বা বলব! সবই তো দুঃখকথা—সেই বারো বছর বয়সে গ্রাম থেকে এই শহরে এলাম, বুঝলি। আমাদের গ্রামের হরি কাকা ছিল বাবার বন্ধু। শহরের কারখানায় কাজ করত; মিস্ত্রি ছিল। তো একদিন বাবা বলল, হরি আমার বড়ো ছেলেটা শহরে গেলে কি কাজকম্ম করে খেতে পাবে— হরি কাকা বলল, তা দিও, নিয়ে যাবখন। এর আগেও হরি কাকা গ্রামের হাবুলকে শহরে এনে কারখানায় কাজ করে দিয়েছিল— বড়ো ভালোমানুষ ছিল রে হরি কাকা— তা মা, ঠাকুমা তো রাজি নয়। শেষে বাবা বলল, শহর তো কাজের জায়গা— পয়সা হাতে পেলে ভালোভাবে বাঁচা যায়— ওই তো খানিক জমি আমাদের, খাবে কী করে! তখন মা ঠাকুমা রাজি হল— তো বুঝলি, শহরে এসে তো এক্কেবারে চোক পাকিয়ে গেল। হরি কাকার ঘরেই থাকি— হরি কাকার দুই ছেলে ছিল, ফুচা আর যদু— যদু মরে গেছে— ফুটা গ্রামেই থাকে— ছেলেপুলে, নাতি - পুতী আছে সবার— তো ওরা হোটেলে কাজ করত। কিন্তু আমি কী কাজ করব! হরি কাকা ভেবে পায় না— শেষে বাবাকে বলে আমাকে হোটেলেই লাগাল— ঠাকুমা শুনে বলেছিল, বাছা আমার এঁটো কুড়োবে। বুঝলি— তো হোটেলেই লাগলাম— মাসে কিছু টাকা পেতাম— খেতেও পেতাম— সত্যি কথা তোকে বলি, মাঝেমধ্যে মালিক সরে গেলে এটা ওটা চুরি করেও খেতাম। তো ভালোই কাটছিল— এদিকে বয়সও বাড়ছিল—ওদিকে হরি কাকার চেরোও অন্য কাজ পেয়ে চলে গেছে— তো তখন আমার ঠাকুমা বলল, এবার আমার পাঁচুর বিয়ে দেব— বাবা, মা-ও বলল। কিন্তু হোটেলের এঁটো কুড়োনোর কাজ করা ছেলেকে কে মেয়ে দেবে বল— তখন আমি একটা কারখানায় কাজ পেলাম বুঝলি— এখানে না, নদীর ওপারে— লঞ্চে চেপে যেতাম— ভালোই মাইনে দিচ্ছিল বুঝলি— তারপর আমার সাথে মালতির বিয়ে হল— হরি কাকা সম্বন্ধ খুঁজছিল— হরি কাকার কোন এক বন্ধুর দাদার মেয়ে যেন, মনে নেই— কিন্তু বিয়ের দু-দিন পরেই শালা কারখানা থেকে চাকরিটা গেল। কী করি, কী করি— তখন মালতির এক দাদা বলল রিকশা চালাও, কাঁচা পয়সা— সেও রিকশা চালাত— তো কারখানায় কাজ করে হাতে কিছু পয়সা ছিল— তাই দিয়েই তো তোকে কিনলাম— শুনে আমার ঠাকুমা মালতিকেই দোষ দিত— ওকে এনেই নাকি আমার এই দশা— বাবা,মা-ও তাই বলত— গ্রামের অনেকেও তাই বলত—

হালকা বাতাস বইছে; তাতে মিশে আছে শীত। কোথাও একটা পাখি ডেকে উঠল। চাঁদের আহ্লাদি আলোয় চারপাশটা বড়ো রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

...আমার খুব রাগ হল জানিস। আর গেলাম না গ্রামে। তারপর ঠাকুমা, বাবা, মা সবাই মরে গেল। শুধু মরণ-খবর পেলেই যেতাম— আমার ভাইবোনেরা সব কিছু করল— পাপ রে সফর, এ আমার ভীষণ পাপ—কিন্তু বল, ওরা মালতিকে দোষ দেয়— আমার কপাল খারাপ তো ও কী করবে— তুই তো জানিস ও কত ভালো ছিল—ও যত বার আমার সাথে গ্রামে গেয়ে তত বার ওকে কত খারাপ কথা শুনতে হয়েছে।

...সফর তোর মালতির কথা মনে পড়ে? ...প্রথম প্রথম তোর গা, গদি, চাকা কাপড় দিয়ে মুছে দিত। বলত, প্যাসেঞ্জার লকখী। জানিস, 'সফর' কথাটার মানে আমি জানতাম না।...গাঁয়ের চাষা মানুষ আমি, কোত্থেকে আর এসব জানব বল! লেখাপড়া তো কিছু শিখিনি।

...মালতি ছিল শহুরে; ও তো কিছুদিন ইশকুলেও গিয়েছিল—জানিস তো প্রথম প্রথম তারজন্য ওকে আমি খুব ভয় পেতাম। —তোর মনে পড়ে সফর, বুল্টু যখন হল তখন তোর গদিতে চেপেই মালতি আর বুল্টু হাসপাতাল থেকে ফিরেছিল—আমি চালাচ্ছিলাম। —তুই তো জানিস না মালতি আমাকে পরে তারজন্য কত বকেছিল। বলেছিল আমি নাকি গেঁয়োভূত। —আজ বুল্টু বাবা হয়ে গেল—আমি দাদু—তোরও তো বয়স

কিছু কম হল না, কত হল রে সফর! তবে আমি তোকে কত যত্ন করতাম, বল— তোর শরীরের সব নাড়িভুঁড়ি তো আমি কত বার বদলেছি— না হলে কি তুই এত দিন বাঁচতিস— অন্য কারুর কাছে হলে কবেই মরে ভূত হয়ে যেতিস। আমি, তুই আমার সবাই বুড়ো হয়ে গেলাম রে...

নীল অন্ধকারে ভেসে চলে পাঁচু মান্না। একটুও কষ্ট শরীরে। দুর্বল সরু পা দুটোতে আজ কোনো বাড়তি শক্তির দরকার হচ্ছে না।

আমি রিকশা টানব শুনে আমার ঠাকুমার সে কী ভয়; বুড়ি বলেছিল, পাঁচু আমার মরে যাবে রে এবার, এই কাঠি কাঠি পায়েও রিকশা টানবে কী করে রে— আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল— কিন্তু যখন তোকে টানতাম তখন কিন্তু আমা কোনো কষ্ট হত না জানিস— কিন্তু এখন আর আগের মতো শরীরে জোর পাই না রে। —আর তারজন্য তোকেও তেমন যত্ন করতে পারি না। সেদিন একটা লোক, বৃষ্টির মধ্যে চেপে বসল তোর ওপর। শরীরটা ভালো ছিল না। ভাঙা রাস্তায় জোরে চালাতে পারছিলাম না। বৃষ্টির জলে ভিজে ভীষণ শীত করছিল; শরীরে শক্তি পাচ্ছিলাম না। ধুমসো লোকটা তোকে আমাকে খিস্তি দিয়ে বলল, শালা যেমন তোর দশা, তেমন তোর রিকশার। —এত রাগ হচ্ছিল না! মনে হচ্ছিল শুয়ারটাকে রাস্তায় ফেলে ওর বুকের ওপর দিয়ে তোকে চালিয়ে নিয়ে যাই। খানকির ব্যাটা বুঝুক তোর-আমার শক্তি...

হেসে উঠল পাঁচু।

হাসতে হাসতেই বুঝতে পারল চারপাশের অন্ধকারের রং কেমন বদলিয়ে যাচ্ছে। ফিকে হয়ে আসছে নীল ভাবটা। জোরে একবার নিশ্বাস নিয়ে পাঁচু আকাশের দিকে তাকাল। সেখানে এক খণ্ড মেঘ ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলেছে চাঁদকে।

দৃষ্টি নামিয়ে আনল পাথরের দিকে। পাথরের ওপর পড়ে থাকা পাথর, খোয়া, ইটের টুকরোর গায়ে এখনও লেগে রয়েছে চাঁদের রং। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীল অন্ধকারটা আবার ফিরতে থাকল পৃথিবীতে। আকাশের দিকে তাকিয়ে পাঁচু দেখল অবাঞ্ছিত মেঘের টুকরোটা নাগাল এড়িয়ে মুক্ত হচ্ছে চাঁদ।

দমকা বাতাসের একাট ঢেউ এসে লাগল শরীরে। শীত ভাবটা বুক থেকে শুরু করে ছড়াতে থাকল সারা শরীরময়।

...জানিস, আমার ঠাকুমা, বাবা-মা কী সুন্দর গেঁয়ো ভাষায় কথা বলত—আমি আর সে-ভাষা বলতে পারি না রে— আর খুব বেশি দিন মনে হয় বাঁচব না রে সফর। আমার তো এত দিন বাঁচারই কথা নয়— আমার মতো সরু পায়ের মানুষেরা নাকি আগেই মড়ে যায়, এক ডাক্তার বলেছিল—কিন্তু আমি বেঁচে আছি—কী করে যে বাঁচলাম, ভগবান জানে— কিন্তু আর বেশি দিন বাঁচব না রে। আর বেঁচেই -বা কী হবে! —জানি, আমি মরে গেলেও তুইও মরে যাবি। কেউ তোকে দেখবে না। মালতি মরে গেল— আমি মরে যাব— তুই মরে যাবি ...আমরা কেউ এই পৃথিবীতে থাকব না রে।

গলা কাঁপে, জল গড়াতে থাকে পাঁচুর চোখ দিয়ে। কাঁপা গলাতেই গান ধরে—

কী জানি আল্লার মর্জি—নসিবের ফের,
চোকা বানে গোরাচাঁদের কাটা গেল ছের...

মধ্যরাতের নিস্তব্ধ বাতাসে গানের ভাষাগুলো ভাসতে থাকে। মহাশূন্যে তা মিলিয়ে যাবার আগেই পাঁচু পুনরায় সুর ধরে; বার বার গায় গানের লাইন ক-টা ঝাপসা দৃষ্টিতে সামনের পৃথিবীটা অলীক মনে হয়। মায়াবী উপত্যকার সর্পিল পথটা আরও মায়াচ্ছন্ন হয়ে আসে।